কবি বিনয় মজুমদার : জীবন ও সৃষ্টি

(নির্বাচিত কবিতার আলোকে)

অমিত কুমার দাস*
বাংলা বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ
মহিষাদল, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১৬২৮, ভারত।
* Email: amittrayy@yahoo.com

‘আমি তার উপেক্ষার ভাষা আমি তার ঘৃণার আক্রোশ’—প্রেমে এমনি বিপর্যাসের ছবি এঁকেছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। ‘যে নক্ষত্র নক্ষত্রের দোষ’ কবির প্রেমের পথে বাধা হয়ে উঠেছিল, তিনি নিজেও তাকে ভুলে গিয়েছিলেন—এমনটাই স্বীকারোক্তি শুনি। কিন্তু এই উপেক্ষা, ঘৃণা যখন প্রেমকে ছাড়িয়ে একজন কবির জীবনের সকল উপান্তকে গ্রাস করে ফেলে—আর ব্যক্তি যদি তাকে কখনোই ভুলতে না পারেন— যদি ভুলতে দেওয়া না হয়—তাহলে জীবনের গান কীভাবে জীবনের গদ্য হয়ে ওঠে? আজীবন আগুনের সেঁক চেয়ে চেয়ে হাঙরের ঢেউয়ে লুটোপুটি খাওয়া এমনি একটি জীবনকে যদি ‘পাগল’ বিশেষণে চিহ্নিত করে অনিবার বিদ্ধ করা হয়, পাগলাগারদে আটকে রেখে এক শ্রেণীর মানুষ যদি আখের গোছাতে চায়— তবে সেই সেই অবমূল্যায়নের নাম দেওয়া যেতে পারে কবি বিনয় মজুমদার।

আজীবন ছিন্নমূল, আজীবন ছন্নছাড়া, আজীবন উপেক্ষিত, আজীবন চক্রান্তের শিকার হওয়া এক নির্জিত মানুষ যদিও বা কখনো প্রতিরোধে হিংস্র হয়ে ওঠেন, আর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে আঠারোবার ইলেকট্রিকের শক দেওয়া হয়—তাহলেই বুঝি তাঁর মধ্যেকার কবিত্বের যত বাষ্প উবে যায়? হাসপাতেলে থেকে কিংবা সেখান থেকে ফিরে এসেও যে মানুষটি লেখনীর অনায়াস শক্তিতে জিতে নেন ‘রবীন্দ্রপুরস্কার’ কিংবা ‘সাহিত্য অ্যাকাডেমি’র মতো মহার্ঘ পুরস্কার—তাঁকে যাঁরা ‘পাগল কবি’র লেবেল সেঁটে দিয়ে নিজেদের দিগ্‌গজ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন—তাঁদের জন্য উপহার হিসেবে রইল কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার নিম্নোক্ত চরণক’টি—

“ ছোট ভীরু হাত দিয়ে

জীবনের মাপ নিয়ে যারা

নীড় বেঁধে নিরাপদ সঞ্চয়ের কড়ি'কটা গোণে

ঈর্ষায় হিংসায়

তোমার বিশালমূর্তি তারা চিরদিন

পঙ্কলিপ্ত করে তো করুক

এসবের বহু ঊর্ধ্বে তুমি অন্য আকাশে উন্মুখ।"[১]

অভিমান হয়—সুতীব্র অভিমান। সে অভিমান কখনো বা স্বাভিমানের রূপ নেয় বৈকি! শুধু কবিতাকে ভালোবেসে যিনি অকাতরে চাকরি ছেড়েছেন, যে মানুষটার খাওয়া জোটেনি দিনের পর দিন, চেয়ে-চিন্তে, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে, নিমন্ত্রণে-অনিমন্ত্রণে দিন কাটিয়েছেন, যিনি নিজেই নিজের দুঃসহ স্মৃতিচারণকে এড়ানোর জন্য জন্মদিনের মতো অনুষ্ঠানকেও বাতিল করে দিয়েছেন, সেই মানুষটিকে নিয়ে যখন হুজুগে মানুষ উৎসবের আয়োজন করেন, আর একান্তে তাঁকে 'পাগল' বলে কৌতুক করে থাকেন, তখন স্বাভিমানে আঘাত লাগে বৈকি! অথচ প্রতিরোধে প্রবল হলেই তুমি প্রতিক্রিয়াশীল? প্রশ্ন এখানেই—কাদের কোন পাগলামি কাকে কী কারণে পাগল সাজিয়েছিল? সন্ধিৎসু গবেষকদের জন্য এ প্রশ্ন তোলা রইল।

লুম্বিনী পার্ক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কবি বিনয়। একবার তাঁকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছিল পুলিশি সহায়তায়। যতটুকু আমরা জানতে পারি, সে যাত্রা তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেদিন আতঙ্কিত হিংস্র কবি দরজা খুলতে চাননি। দিনের পর দিন অকৃতদার এই মানুষটির সম্পত্তির লোভে তাঁকে ভীষণ অভিজ্ঞতার মুখে ঠেলে দিয়েছেন যারা, তারা পাগল নাকি কবি বিনয় মজুমদার? আসলে ক্ষতের কাছেই ফিরে ফিরে আসে মাছি। তাই 'সানন্দা' পত্রিকায় কবি বিভাস রায়চৌধুরী লেখেন 'কেউ বলে পাগল' নিবন্ধটি। শোনা যায়, কবি এ লেখা দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। 'মেথর বিনয়দা' শিরোনামের একটি কবিতাও বিদ্ধ করেছিল বিনয় মজুমদারকে। তাই খুব দুঃখ করে বিনয় মজুমদারকে বলতে শুনি—" ...ভারতবর্ষে আমাকে সাতবার পাগলাগারদে পোরা হয়েছে। অনেকেই তো পাগলা গারদে ছিলেন, তাঁদের জীবনীতে তা লেখা হয় না। আর আমার জীবনী লিখতে গেলে প্রথম বাক্যই লেখে—'গোবরা মানসিক হাসপাতালে ছিলেন...।' পাগলা গারদে আর কে কে ছিলেন শুনবে? লুম্বিনী পার্কে ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক। এঁদের জীবনী

যখন লেখে তখন তো এসব একথা এভাবে লেখে না যে এঁরা পাগলা গারদে ছিলেন। অথচ আমার ক্ষেত্রে প্রথমেই ওই কথা—'মানসিক হাসপাতালে ছিলেন......'।"[২]

হাসপাতালে বসেই কবি লেখেন 'হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ'—যা সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নক্ষত্রের আলোয়' তেমন জনপ্রিয়তা না পেলেও 'গায়ত্রীকে' (১৯৬১) প্রকাশের পর থেকে কবি নানাজনের দ্বারা অভিনন্দিত হন। তবে তাঁর যা কিছু জনপ্রিয়তা 'গায়ত্রীকে'র পরিবর্ধিত সংস্করণ 'ফিরে এসো, চাকা'র কারণে। ৮ই মার্চ ১৯৬০-এ 'ফিরে এসো, চাকা'র ১ম কবিতা লেখা হয়। ১৯৬১তে কবিকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। ২৯শে জুন ১৯৬২-তে ফিরে এসে 'ফিরে এসো চাকা'র শেষ কবিতা লেখা হয়। ১৯৬৪-তে 'ফিরে এসো, চাকা' 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে প্রকাশ পায়। ১৯৬৫-তে বেরোয় ঈশ্বরীর কবিতাবলী' যেখানে 'আমার ঈশ্বরীকে'র সব কবিতাই মুদ্রিত হয়। পরে এই নামটি পরিবর্তিত হয়ে 'ফিরে এসো, চাকা'র কলকাতা সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭০-এ। এরপর থেকে গ্রন্থটির আর নাম পাল্টায়নি।

আগেই বলেছি, কবি বিনয় মজুমদারের যা কিছু জনপ্রিয়তা তাঁর 'ফিরে এসো, চাকা'র কারণেই। এ কাব্যের সংখ্যা-চিহ্নিত কবিতাগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ঠিকই, তবু সেগুলি যেন প্রেমিক কবি বিনয় মজুমদারের জীবনের দিনপঞ্জির মতো— কালানুক্রমিক ভাবনাকে ধারন করে আছে। কবিতাগুলি বিচ্ছিন হলেও এক যৌগ রসায়নে বাঁধা থাকে এভাবেই। এ গ্রন্থের নাম পালটে 'আমার ঈশ্বরীকে' লেখার সময় ভূমিকা অংশেই কবি জানিয়েছিলেন—"প্রত্যেক সংখ্যা অংশতই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা। এবং কালানুক্রমে দিনপঞ্জি রূপে লিখিত কবিতাবলী একযোগে একখানি পূর্ণ কাব্যও।"[৩]

১৪ই অক্টোবর কবি বিনয় মজুমদার 'ফিরে এসো, চাকা'র ৬ সংখ্যক কবিতায় লিখলেন—

"কাগজকলম নিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকা প্রয়োজন আজ;

প্রতিটি ব্যর্থতা, ক্লান্তি কী অস্পষ্ট আত্মচিন্তা সঙ্গে নিয়ে আসে।"[৪]

পাগলের প্রলাপ? কখনোই নয়। বরং কবি জানান—"কারো সঙ্গে কথা না বলে কেবল আপন মনে বাস করা। এমন মানসিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা, যার ফলে একাকীত্ববোধ আর থাকে না। আমি অবশ্য নিজেই ঈশ্বরীরূপে আমার কানের কাছে চিরকাল কথা বলি এবং মুখ দিয়ে ঈশ্বররূপে তার জবাব দিই। এইভাবে

আমাদের বাক্যালাপ চলে। ভালোবাসাবাসি চলে।"[৫] এ হল কবির প্রগাঢ় উপলব্ধি, স্বকীয় কাব্যনির্মাণকৌশল। মানসিক সম্পূর্ণতা—বলা যেতে পারে উপলব্ধির গাঢ় অভিপ্রকাশই একটি শ্রেষ্ঠ কালজয়ী কবিতার জন্মদিতে পারে। কবির পূর্বোক্ত বর্ণনা আসলে কবিতাজননের একটি মৌল সূত্রেরই সহজ অভিপ্রকাশ।

শুধু তাই নয়, কবিতার এই নাটকীয় সূত্রপাত আমাদের মনে প্রশ্নকে উজ্জীবিত করে, ভালো করে কোন কথা ভাবা খুব কঠিন আজ? হয়তো তাই। হয়তো মেনে নেওয়ার সময় এসেছে যে, সৃষ্টির মনের কথা মনে হয় দ্বেষ! তাহলে প্রেম, ভালোবাসা—এ-যাবৎ লেখা তাবৎ পৃথিবীর অগণন প্রেমের কবিতা—সব মিথ্যে?তা হয়তো নয়। প্রেম ছাড়া কি দিন বদলের গান হয়?প্রেমের কবিতা ছাড়া পেটুক কাব্যিকতারই বা কি মানে আছে? আসলে কি এক অবিশ্বাস আর অনির্দেশ্য অনিশ্চয়তা এই অস্থির সময়ে প্রেমের মধ্যে ঘুণপোকার লালনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলছে। তাই আজ—এই উত্তর-আধুনিক যুগে—প্রেমে বিপ্রলম্ভের সুর বড় প্রকট। এই সুর জন্ম দিচ্ছে প্রেমের আর এক নবীন অভিজ্ঞানকে, শুধু কবি বিনয়ের সমর্থ কলমে—

"সতত বিশ্বাস হয়, প্রায় সব আয়োজনই হয়ে গেছে, তবু

কেবল নির্ভুলভাবে সম্পর্কস্থাপন করা যায় না এখনো।"[৬]

সম্পর্কের আধিসৌধে যে বর্ণিল আয়োজনই থাকুক যদি তার বুনিয়াদেই গলতি থেকে যায় তাহলে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে সেই রঙিন সৌধখানি। আমরা জানি, ছয় ও সাতের দশকে যে অস্থির সময়ের মাঝে কবি বিনয় মজুমদার এ উচ্চারণ রাখছেন, পুঁজিবাদী সমাজ আর তার মূল্যবোধ তখন গভীর থাবা বসিয়েছে আমাদের জীবনে।নবীন অর্থনীতির পরিবর্তিত বুনিয়াদ পালটে দিচ্ছে আমাদের সমাজের আমূল সুপারস্ট্রাকচারটাকেই—আমাদের সংস্কার, বিশ্বাস, মূল্যবোধগুলোকে। 'বেলা-অবেলা-কালবেলা' গ্রন্থের '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় অনেক আগেই পুঁজিবাদী দুনিয়ায় অর্থনীতি কীভাবে আমাদের জীবনের একটা বড় নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছে, ক্যাপিট্যালিস্ট মূল্যবোধ কীভাবে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে পণ্যে পরিণত করছে সে কথা জানিয়েছিলেন কবি জীবনানন্দ—

"পৃথিবীতে সুদ খাটে: সকলের জন্য নয়।

অনির্বচনীয় হুন্ডী একজন দু-জনের হাতে।

পৃথিবীর এইসব উঁচু লোকেদের দাবি এসে

সবই নেয়; নারীকেও নিয়ে যায়।”

নারীর হৃদয়ে এই যে রক্তক্ষরণ তা তার হৃদয়বৃত্তির সহজ প্রকাশকে স্বতস্ফূর্ত হতে দেবে কীভাবে? ফলে, জীবন সম্পর্কে একধরণের অপচিতিবোধ বা অচরিতার্থতার বোধ সত্তার গহনে গভীর ক্লান্তি আর অবিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলে। “সেই ফাঁকটুকুকে মেরামতের কৃত্রিম প্রয়াসের মধ্যেই কিন্তু গড়ে ওঠে আধুনিক জটিল জীবনের ক্লিন্ন যান্ত্রিকতা। মুখোশের আড়ালে লুকানো থাকে আর এক ঝলসে যাওয়া মুখ। সত্তার এই বিপড়নধর্মিতায় সম্পর্কের সূক্ষ্ম সূত্রগুলোও ছিঁড়তে থাকে, ছিঁড়ে যায়। প্রিয় মানুষ ভুল বুঝে দূরে সরে যায়। চলে অন্তর্গত রক্তক্ষরণ, তবু মিথ্যা অহমিকা কিংবা ব্যক্তিত্বের গৌরবে ছাড়া যাবে না স্বস্থানের সূচ্যগ্র মেদিনী। তাই–

“স্রোতপৃষ্ঠে চূর্ণ চূর্ণ লোহিত সূর্যাস্ত ভেসে আছে;

নিশ্চল, যদিও নিম্নে সংলগ্ন অস্থির স্রোত বয়।

এখন আহত মাছ কোথায় যে চলে গেছে দূরে,

তুমিও হতাশ হয়ে রয়েছো পিছন ফিরে পাখি।”

এভাবেই পাখি হয়ে ওঠে বিনয়ের কবিতায় কখনো বা প্রেমিকার রূপকল্প, যার ঠোঁটের আঘাতে পুরুষ-মাছ দূরে চলে গেছে। পাখিও হতাশ হয়ে জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। নষ্ট সম্পর্কের এই সাতকাহনই কি তাহলে জীবনের চূড়ান্ত ভবিতব্যতা?”[৭]

হয়তো তাই। এ এমন এক সময়, যখন ‘মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়’। ‘প্রকৃত সারস’-কে ছাড়াই তাই এই যন্ত্রদুনিয়ায় গড়ে ওঠে প্রেমের আর এক অভিজ্ঞান, বিলাসী প্রেমের নিষ্ফল শূন্যতার নবীন বিন্যাস–

“পায়রা ছাড়া অন্য কোনো ওড়ার ক্ষমতাবতী পাখি

বর্তমান যুগে আর মানুষের নিকটে আসে না।

সপ্রতিভভাবে এসে দানা খেয়ে ফের উড়ে যায়"[৮]

কিন্তু প্রকৃত সারস ছেড়ে কি আর দানা খাওয়া সুখের পায়রা নিয়ে মানুষের চিরকাল দিন চলে? সারস তো তার চারদিকে তৈরি করেছে এক ভয়তাড়িত দুর্ভেদ্যতার কাঁটাবেড়া। তাই সেই সারসের খোঁজ পেতে আমরাও তো 'পত্রের মতো ভুলে / অন্য এক দুয়ারের কাছে উপনীত হয়ে যাই'।[৯]

এই 'অন্য এক দুয়ারে'র নিহিতার্থ ঠিক কত রকম হতে পারে? সংখ্যাটা আমার জানা নেই। তবে মনে পড়ে যাচ্ছে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা একটা গল্পের কথা—'উত্তরের ব্যালকনি'। এ গল্পের নায়িকা একদা যাকে ভালোবেসেছিল সে আজ পাগল, বসে থাকে তারই ব্যালকনির উত্তর দিকে,খানিকটা দূরত্বে। সেই অপরাধবোধ হয়তো কোথাও কাঁটা হয়ে স্বামীর প্রতি ভালোবাসাকে কতকটা আড়াল করে রাখে। তাই সম্পর্কের মাঝে জন্ম নেয় ক্লিন্ন যান্ত্রিকতা, কিছু না-পাওয়ার বেদনা। তাই গোপন যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় এই পুরুষটি। সারাদিনের কাজের পর বিকেলগুলো যখন ভারি হয়ে ঘিরে ধরে তাকে, তখন বাঁধ ভাঙ্গে স্থৈর্যের।অট্টালিকা-সমান বাড়িতে পাগলের মতো পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারা, উদভ্রান্ত হৃদয়ে বারবণিতার ঘরে ওঠা, বাঁকা পথে জীবনকে উপভোগ করতে চাওয়ার মতো আধুনিক জীবনের জটিল অপহ্নবগুলি 'পত্রের মতো ভুলে / অন্য এক দুয়ারের কাছে উপনীত হয়ে যাই'-এর কত যে তাৎপর্যকে জাগিয়ে তোলে তার ইয়ত্তা নেই।

আসলে দূরের পরিচয়ে প্রেম সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে বলেই হয়তো তখন তা বর্ণালেপনে সৃষ্ট সুন্দর এক আলেক্ষ্য হয়ে ধরা দেয়। তখন মনে হয়—" ...অগণন কুসুমের দেশে/ নীলাভবর্ণ গোলাপের অভাবের মতো/ তোমার অভাব বুঝি"[১০]। কিন্তু প্রতিদিনের ধোয়া-মোছায় এই 'অভাবে'র চাদরটা সরে গেলেই 'উত্তরের ব্যালকনি' গল্পের নিষ্ঠুর সত্যটা যেন জেগে ওঠে। কবি আমাদের সেই সত্যের উন্মোচন করে জানান—

"সকল ফুলের কাছে এতো মোহময় মনে যাবার পরেও

মানুষের কিন্তু মাংসরন্ধনকালীন ঘ্রাণ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।

বর্ণাবলেপনগুলি কাছে গেলে অর্থহীন, অতি স্থূল ব'লে মনে হয়।"[১১]

'মাংসরন্ধনকালীন ঘ্রাণ' প্রেমের শরীরী আকর্ষণের তাৎপর্যবাহী। প্রেমের মূলে নিহিত কামের প্রবল পরাক্রমের কাছে প্রায়শই নষ্ট হতে বসে প্রেমের পূজা। রবীন্দ্রনাথে যেমন আমরা দেখেছি, অচরিতার্থ প্রেম শেষ পর্যন্ত পূজা মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছে দুঃখের আলোতে, বিনয় মজুমদারে প্রেমের সে তপস্যা বাস্তবের কঠিন ছোঁয়ায় ভেঙে চুরে গেছে বার বার। হয়তো এভাবেই ভেঙে চুরে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। তখন শুধু বেঁচে থাকে এক চাপা করুণ আর্তনাদ—'প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই'। আলোময় প্রেম, আলেখ্যের মতো রঙিন সুন্দর প্রেম জীবনের বাস্তব দাবির কাছে হয়তো ক্ষয়ে যায় এভাবেই—

"করুণ চিলের মতো সারাদিন, সারাদিন ঘুরি।

ব্যথিত সময় যায় শরীরের আর্তনাদে, যায়

জ্যোৎস্নার অনুনয়; হায়, এই আহার্য সন্ধান।"[১২]

'শরীরের আর্তনাদ'-কে বাদ দিয়ে জ্যোৎস্নাময় স্নিগ্ধ পবিত্র প্রেমকে সত্যিই কি আন্তরিক ভাবে পাওয়া যায়? ফলে প্রেমে 'অপচয়' অনিবার্য হয়ে ওঠে। আশ্রয় না পেয়ে এমন কত প্রেমই অকালে করুণ ভাবে ঝরে যায়। যে প্রেম এই পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির মৌল প্রেরণা সেই প্রেমের অনেকটাই আসলে ঝরে যায় অস্থানে, কিংবা নষ্ট হয়। কবি তাই জানান—

"হে আলেখ্য, অপচয় চিরকাল পৃথিবীতে আছে;

এই যে অমেয় জল—মেঘে মেঘে তনুভূত জল—

এর কতটুকু আর ফসলের দেহে আসে বলো?

ফসলের ঋতুতেও অধিকাংশ শুষে নেয় মাটি।"[১৩]

অনবদ্য উপমা প্রয়োগ, অনবদ্য শব্দচয়ন, অনবদ্য কবিতার সংহতি, অনবদ্য প্রকাশভঙ্গি, বক্তব্যের ঋজুতা। এই একখানা কাব্যগ্রন্থের জন্য কবি বিনয় মজুমদার হাজার বছর পরমায়ু দাবি করতে পারেন। শব্দপ্রয়োগের এই অসাধারণ দক্ষতার কারণেই জ্যোতির্ময় ঘোষ সুতপা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত উজ্জীবন-১ পত্রিকায় ১৪১৪-এর বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় 'কয়েকজন সাম্প্রতিক কবি: তাঁদের কবিতা' প্রবন্ধে বিনয় মজুমদারের কবিতা বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—"জীবনানন্দের শব্দভাণ্ডারও সুধীন্দ্রনাথের গদ্যাত্মক বিন্যাস

কোনো অভিনব রসায়নাগারে জৈবিক প্রথায় মিলিয়ে দিলে বিনয়ের কবিতার কাছাকাছি পৌঁছায়।” এ কবিতায়ও দেখি ‘অধিকাংশ শুষে নেয় মাটি’—এই বাক্যবন্ধে ‘মাটি’ আমাদের জীবনের রূঢ় প্রয়োজনের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। সেই প্রয়োজন অকাতরে খুন করে জীবনের অগণন বসন্তকে। নষ্ট হয় প্রেমের কুসুম। ‘শরীরের আর্তনাদে’ ধুলিস্যাৎ হয় প্রেমের তপস্যা। সমৃদ্ধ প্রেমিক হতে না পারার হীনমন্যতাবোধ তখন আমাদের সত্তাকে কুরে কুরে খায়। তবু একজন বোধিসমন্বিত মানুষ, একজন শিল্পী মানুষের প্রেমে যতই ‘শরীরের আর্তনাদ’ মিশে থাকুক না কেন মশা, মাছি,কীট, পতঙ্গের প্রেম তার সাধনা হতে পারে না। তাই—

“ভাবি যে ফুলকে ধরে ফলবতী করে দিতে পারে শুধু কীট;
শিল্পী তা পারে না; সেই দূরত্ব কি জানত না সৃষ্টির নিয়মে
সূর্য দেয় তাপ আলো প্রণয় জীবনীশক্তি যা প্রয়োজনীয়।
হয়তো একথা তার জানা ছিল হয়তো সে ভোরের পরেই
স্বেচ্ছায় সূর্যের নীচে শুতে চেয়েছিল সেই মাঠের উপরে
যেখানে কেবলি কীট মাছ পাখি কাছে কোনো মানুষ ছিল না।
যেখানে সূর্যের নীচে হয়তো বা চিৎ হয়ে শুতে চেয়েও সে
শোয়নি কারণ শুধু কাদা আর জল আর ঘন কাঁটাবন।”[১৪]

চাওয়া আর পাওয়ার মাঝে তখন কত যে গল্প পুড়ে যায়, কত রক্তক্ষরণ ঘটে, তার কতটুকু হিসেবই বা আমরা পাই?তাই ক্ষয়ে যাওয়া প্রেম এক নিরন্তর দংশন হয়ে শরীর-মনকে বিদ্ধ করতে থাকে। জীবনানন্দের কবিতায়ও দেখেছি, যে প্রেম ধুলো আর কাদার নামান্তর হয়ে গেছে, সেই হারানো প্রেমের স্মৃতি বা না-পাওয়ার রিক্ততার মাঝে জমাট হয়ে ওঠা ঘুম-ভাঙানিয়া প্রেম অগোচরে বার বার আহ্বান জানায়—প্রেমের স্বপ্ন দেখায়। হারিয়ে যাওয়া বিবর্ণ প্রেম আবার কত কত শীত বসন্তের শেষে নবীন বর্ষার দিনে বিরহকে গাঢ় করে তোলে। তখন দূরের পরিচয়ে হারানো প্রেম হয়ে ওঠে আষাঢ়ের জলভরা মেঘের মতোই সরস, টইটম্বুর, মন-কেমন-করা। শরীরী প্রেমের কাদায়, সম্পর্কের জটিলতার কাঁটাবনে যে প্রেমে ‘শুধু তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়’ তা কাছের পরিচয়ে উপবিষ্ট মশার তীক্ষ্ণ কামড়ের মতোই যন্ত্রণাদায়ক। অথচ সেই প্রেম আবার যখন হারিয়ে যায়,

না-পাওয়ার শুন্যতা গভীর হয়, দূরের পরিচয়ে তা-ই গভীর ও সরস হয়ে আসে। তখন তা আমাদের সত্তাকে স্বতন্ত্র সুশ্রুষা দেয় মধুর সঙ্গীতের মতোই। অনবদ্য এক চিত্রকল্পে কবি বিনয় মজুমদার জানান—

"তবু কী আশ্চর্য, দ্যাখো, উপবিষ্ট মশা উড়ে গেলে

তার এই উড়ে যাওয়া ঈষৎ সঙ্গীতময় হয়।"[১৫]

হাসপাতাল থেকে ফিরে ১৯৬১-এর ১৯ শে জুলাই কবি লিখলেন 'ফিরে এসো, চাকা'র ১৮ সংখ্যক তাঁর বিখ্যাত 'বেশ কিছুকাল হল' কবিতাটি। যে প্রেম জীবন থেকে চলে গেছে, এ-কবিতায় তার জন্য কবির হৃদয়ে বিপ্রলম্ভ সুর তীব্র হয়ে উঠেছে। হয়তো উপবিষ্ট মশা উড়ে যাওয়ার কারণেই প্রেম কবির কাছে দূরের পরিচয়েই সঙ্গীতময় হয়ে উঠেছে। আমরা সকলেই জানি, 'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থের প্রেমের কবিতাগুলির আড়ালে যার মুখ বার বার ফুটে ওঠে তার নাম গায়ত্রী চক্রবর্তী। ইডেন হস্টেলে থাকার সময়েই গায়ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয় কবির। তখন তিনি বালিকা মাত্র। এই গায়ত্রী আজকের গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, ইংরেজী সাহিত্যের স্বনামধন্যা অধ্যাপিকা, তাত্ত্বিক দেরিদার প্রিয় ছাত্রী, পোস্ট কলোনিয়াল তত্ত্বের প্রবক্তাদের অন্যতমা। কবি নিজেই জানিয়েছেন—"যিনি আমার গুরুদেব ছিলেন বাংলা ভাষা পড়াতেন আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে সেই জনার্দন চক্রবর্তীর মেয়ে হল গায়ত্রী চক্রবর্তী। ইডেন হিন্দু হস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টও ছিলেন। আমি ওই হস্টেলে থেকেছি দুই বছর। গায়ত্রীর বয়স তখন কত হবে? ১০-১১-১২ বছর। আমার তখন হবে ধরো ১৬-১৭-১৮ বছর। তখন আমি ওকে দেখেছি। এরপর তো হস্টেল থেকে চলে এলাম। বি. ই. ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লাম। চাকরি করলাম। চাকরি করার পর বেকার বসে বসে কবিতা লিখলাম। তখন গায়ত্রী বি. এ. পাশ করেছে। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। ফের দেখলাম। তখন লিখলাম ৭৭টি কবিতা।"[১৬] এই কবিতাগুলিই 'ফিরে এসো, চাকা'র অনবদ্য সব প্রেমের কবিতা।

সুতরাং যে গায়ত্রীকে কবি কিশোরী অবস্থা থেকে দেখেছিলেন, হয়তো মুগ্ধতার শুরু তখন থেকেই। কিংবা ক্লাসে প্রথম হওয়া পূর্ণ যুবতী গায়ত্রীকে দেখে কবির মনে জন্ম নেয় মুগ্ধতা। সেই মুগ্ধতাই ক্রমে গাঢ় হয়ে জন্ম দিতে থাকে 'ফিরে এসো, চাকা'র অনবদ্য প্রেমের কবিতাগুলি। অবশ্য কবির ক্ষেত্রে সুন্দরী বিদূষিণী গায়ত্রী চক্রবর্তীর প্রেমে পড়া, প্রত্যাখ্যাত হওয়া এবং সুতীব্র প্রেমের অচরিথার্থতার বেদনায় উন্মত্ত অবস্থায় পৌছে যাওয়ার মতো প্রচলিত কাহিনীগুলি কতটা সত্যি কতটা পল্লবিত তা সত্যিই বলা

মুশকিল। কবি বিনয় একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, গায়ত্রীর সাথে তাঁর কোনো কথাবার্তা হয়নি কোনোদিন। আবার তিনিই অন্য একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—“আমি যখন ইডেন হিন্দু হোস্টেলে ছিলাম—তখন ওর বয়স বছর ১২। তখন থেকে দেখেছি। পুরোহিতের মেয়ে তো। বেশি কথাবার্তা হয়নি। আলাপ-আলোচনা হত। কবিতা নিয়ে। ‘কবিতা লিখেছি কবে, দুজনে চকিত চেতনায়’—বুঝলে তো!”[১৭] তবে প্রেমে যে পড়েছিলেন বিনয় মজুমদার একথা সত্য। সেই প্রেমে প্রত্যাখ্যানের সুর বা বিপ্রলম্ভের সুরই প্রধান হয়ে উঠেছে। গভীর আত্মদাহের ভাষাই ‘ফিরে এসো চাকা’র প্রতিটি কবিতার শরীরকে নিটোল ভাব আর গঠন নির্মিতি দান করেছে। ১৮ সংখ্যক কবিতাটি তারই পরিচয় বহন করে।

এ কবিতার শুরুতেই এসেছে বিচ্ছেদের কথা—‘বেশ কিছুকাল হল চ’লে গেছো’। এই চলে যাওয়াটা শারীরিক। কিন্তু মনের মাঝে ‘অস্থির স্রোত বয়’। এই চেতনা-স্রোত প্রতিনিয়ত স্মৃতির বারুদে মনকে পোড়ায়। পোড়া মন পুড়ে ছারখার। অন্যদিকে মুখ ফেরাবার অবসর কই? তাই অনিবার দহন—

“কাঁটার আঘাতদায়ী কুসুমের স্মৃতির মতন

দীর্ঘস্থায়ী তার চিন্তা প্রথম মিলনকালে ছেঁড়া

ত্বকের জ্বালার মতো গোপন, মধুর এ বেদনা।”[১৮]

এই বেদনার দহন শুষে নেয় ব্যক্তিজীবনের সরসতা,সরলতা, শ্যামলতাটুকুকে। অথচ চারপাশে বয়ে চলে বিপরীত এক জীবনের প্রবাহ। জীবনের এই নাটকীয় প্রেক্ষিতকে চিহ্নিত করে কবির অকপট স্বীকারোক্তি—

“......চতুর্দিকে সরস পাতার

মাঝে থাকা শিরীষের বিশুষ্ক ফলের মতো আমি

জীবনযাপন করি;”[১৯]

অনবদ্য উপমা ‘শিরীষের বিশুষ্ক ফল’। নির্বিকল্প বিরহ বুঝি জীবনকে এরকমই দার্ঢ্য করে তোলে—শুকিয়ে কঠিন হয়ে যাওয়া শিরীষের ফলের মতো! কিন্তু এ জীবন আগুনের সেঁক চায়, ঢেউয়ের মাথায় হাঙরের মতো লুটোপুটি খেতে চায়। তাই প্রার্থনা—‘প্লাবনের মতো একবার এস ফের’।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"বিরস দিন বিরল কাজ, প্রবল বিদ্রোহে

এসেছ প্রেম, এসেছ আজ কী মহা সমারোহে।।

একেলা রই অলসমন, নীরব এই ভবনকোণ,

ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ অপরাজিত ওহে।।"[২০]

'প্রবল বিদ্রোহে' যে প্রেম এসে পড়ে, যা নিরাসক্তি আর একাকীত্বের সব প্রাচীর ভেঙে চুরে দেয়, সে প্রেমই তো 'প্লাবনের মতো' প্রেম! শুধু রবীন্দ্রনাথে যে-প্রেম না চাইতেই মহাসমারোহে এসে উপস্থিত হয়, বিনয় মজুমদারের কাব্যে সে প্রেম এক করুণ প্রার্থনার বিপ্রলম্ভ সুর হয়ে বাজে। কারণ এ প্রেমে প্রাপ্তি সামান্য, তুলনায় হারানোর যন্ত্রণা অনেক বেশি। এই প্রেম পাবার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বিনয় মজুমদার তাই জানান—

"...কদাচিৎ কখনো পুরোনো

দেয়ালে তাকালে বহু বিশৃঙ্খল রেখা থেকে কোনো

মানুষীর আকৃতির মতো তুমি দেখা দিয়েছিলে।"[২১]

গায়ত্রী চক্রবর্তীর প্রতি কবির মুগ্ধতার জন্ম, সেই মুগ্ধতা থেকে প্রেমের বিকাশ আর অচিরেই তার চলে যাওয়া হয়তো কবিকে অনুরূপ এক চিত্রকল্প রচনায় প্রাণিত করে থাকবে। এ কেমন প্রেমিকা, যাকে ঠিক 'মানুষীর আকৃতির মতো' মনে হয়? 'মতো' শব্দটির প্রয়োগ প্রেমিকার বহুমাত্রিক বিমূর্ততাকে দ্যোতিত করে তোলে যেন। নাকি— কবি কিছু তীর্যকতার আভাস রেখে যান?না পাওয়ার শূন্যতার মাঝে প্রেমিকার রূপ তাই কবির কল্পনায় নানা ছবির কোলাজ হয়ে ওঠে। কবিতার মজ্জায় সঞ্চারিত হয় বহুস্তর ব্যঞ্জনা—যেমনটা রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা দেখেছি।একটা সুনির্দিষ্ট অবয়বে তাকে ধরা যায় না তখন। বিনয় মজুমদারের অধিকাংশ কবিতায় এ বৈশিষ্ট্যের অবশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে। গায়ত্রী চক্রবর্তীর হারিয়ে যাওয়া যেন পুরনো দেওয়ালের বিশৃঙ্খল রেখা থেকে 'কদাচিৎ' প্রতিভাসে জেগে ওঠা না-পাওয়া প্রেমের অস্পষ্ট বেদনা-মাধুরী। এখানেই তীর্যকতার রেশটুকুকে বুঝে পাই। আর ঠিক এর পরপরই কবি লেখেন—

"পালিত পায়রাদের হাঁটা, ওড়া, কুজনের মতো
তোমাকে বেসেছি ভালো; তুমি পুনরায় চ'লে গেছো।"[২২]

পালিত পায়রার এই চিত্রকল্প যেন কবিতার মধ্যেকার তীর্যকতাকে বাঙ্ময় করে তুলেছে। পায়রার চিত্রকল্পে রয়েছে বিলাসী প্রেমের ভাব-অভিক্ষেপ। 'ফিরে এসো, চাকা'র ৬৫ সংখ্যক কবিতায় কবি নিজেই জানিয়েছেন—

" ভালোবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম?
লীলাময়ী করপুটে তোমাদের সবই ঝ'রে যায়—
হাসি, জ্যোৎস্না, ব্যথা, সৃষ্টি, কিছুই থাকে না। ....
এতই সহজ, তবু বেদনায় নিজ হাতে রাখি
মৃত্যুর প্রস্তর, যাতে কাউকে না ভালোবেসে ফেলি।
গ্রহণে সক্ষম নও। পারাবত, বৃক্ষচূড়া থেকে
পতন হলেও তুমি আঘাত পাও না, উড়ে যাবে।
প্রাচীন চিত্রের মতো চিরস্থায়ী হাসি নিয়ে তুমি
চলে যাবে; ক্ষত নিয়ে যন্ত্রণায় স্তব্ধ হব আমি।"[২৩]

সুতরাং ১৮ সংখ্যক কবিতায় যে 'পালিত পায়রা'র চিত্রকল্পটি কবি ব্যবহার করেছেন তা প্রেমিকার বিলাসী প্রেমের দিকেই তীর্যক ইঙ্গিত দেয়। পায়রার 'হাঁটা, ওড়া, কুজনের মতো'ই কবি সহজভাবে ভালোবাসতে চেয়েছেন। কিন্তু দানা খেয়ে উড়ে যাওয়া তো বিলাসী পায়রার স্বভাব। তাই 'তুমি পুনরায় চলে গেছো'। 'পুনরায়' শব্দটির ব্যবহার বিলাসী প্রেমের ভাসমান রূপটিকে প্রকট করে তোলে। এ প্রেম স্বাচ্ছন্দ্য বোঝে, সুখ বোঝে, বলাসিতা বোঝে, আড়ম্বর বোঝে, যথেচ্ছাচার বোঝে—ভালোবাসা বোঝে না, দারিদ্র্য সইতে পারে না। কথাগুলো তো প্রেমিক কবির দারিদ্র্যপীড়িত ব্যক্তিজীবনে না-পাওয়া কিংবা হারানো প্রেমের বিবিক্ত ছায়াপাত মাত্র। ভালোবাসা তিনিও দিতে চেয়েছেন—গায়ত্রীকে, তাঁর ঈশ্বরীকে। কিন্তু তিনিও গ্রহণে সক্ষম হননি

হয়তো বা। এইভাবে দানা খেয়ে উড়ে যায় যে পারাবত, ভালোবাসা বেচে যারা জীবন কেনে, প্রেমের মাধুর্য বা বা রোমাঞ্চ সে জীবনের মাঝে ঠিক কতটা থাকে? প্রেমে মন নেই, ঐকান্তিকতা নেই, শুধু অভিনয় আছে। সুতরাং এমননষ্টপ্রেমের ভূমিতে মন-বর্জিত আত্মদানে ভালোবাসার যে নষ্ট বীজ অবিরাম উপ্ত হয়ে চলে তার প্রতি কবির তীর্যক মন্তব্যের আভাস তাঁর একাধিক কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত—

“পচা শবে মৃত্তিকায় পুষ্পকুঞ্জ জন্ম পেল নাকি?
বেশ কিছুকাল হল লীলাময়ী রসার্ত বয়স
কাদের গৃহস্থবধূ হয়েছে, কীভাবে জানি না তা।
লতারা কীভাবে বোঝে কাছে কোনো মহীরূহ আছে ,

তারপরে আরোহন করে তার জীবনযাপন
করার সফল কীর্তি কীভাবে যে করে, তা জানি না।
তবু বৃক্ষ সনাতন বৃক্ষই, লতা শুধু লতা,
মৌমাছি ও কুসুমের অভীপ্সার রোমাঞ্চ জানে কি?”[২৪]

১৯৬১-এর ২০ শে জুলাই কবি লেখেন ‘ফিরে এসো চাকা’র ২১ সংখ্যক কবিতা। এ কবিতায় কবির প্রেম ভাবনায় মিশেছে অভিজ্ঞতা আর চিন্তার সমান্তরাল প্রতিভাস। কবিতায় চিন্তার এই বিশেষ নির্মাণ বিষয়ে এই সময়ে লেখা একটি চিঠিতে কবি বিনয় মজুমদার জানাচ্ছেন—“ ...চিন্তা করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে যে-পদ্ধতিতে ভাবলে কাব্যিকতা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বিষয়বস্তুর মধ্যে কাব্যিকতা লুকিয়ে থাকে, তাকে বের করার জন্য চিন্তার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এসব কথা আমি টের পাই, বুঝতে পারি **১৯৬০** খ্রীষ্টাব্দের গোড়া থেকে।”[২৫] সম্ভবত চিন্তা করার এই পদ্ধতিটাই কবির কাছে ভাষা ছন্দ আর নির্মিতির নামান্তর হয়ে দেখা

দিয়েছিল। এ কবিতায় শুরুতেই অভিজ্ঞতার রূপায়ণে সেই চিন্তার পদ্ধতি স্পষ্ট—উপমার অনবদ্য প্রয়োগে—“অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতার/ সংবাদের মতো আমি জেনেছি তোমাকে;”।

কবি তখন বুঝেছিলেন ‘বিষয়বস্তুর মধ্যে কাব্যিকতা লুকিয়ে থাকে’, আর এ কবিতার বিষয় প্রেম। সুতরাং তার মধ্যে কাব্যিকতা থাকারই কথা। যে প্রেম কবির কাছে দূর থেকে দেখা ‘আলেখ্য’ হিসেবে ধরা দিয়েছিল একদা, কাছে এসে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাকে কিছু আলাদা করে বুঝেছেন। কেননা তিনি ততদিনে হয়তো জেনে গেছেন—“আলেখ্যশ্রেণী কিছুটা দূরত্বহেতু মনোলোভা হয়ে ফুটে ওঠে’। সুতরাং আমরা যেমন প্রাথমিক ভাবে জেনেছিলাম আকাশের রঙ নীল, ক্রমে বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার অর্জনে জেনেছি আকাশের কোন বর্ণ নেই, কবিও ঠিক তেমনিভাবে তাঁর প্রেমিকাকে অন্যরকম জানা দিয়ে নতুন করে জেনেছিলেন—

“এতকাল মনে হতো, তুমিও এসেছো অভিসারে—

চাঁদের উপর দিয়ে স্বচ্ছ মেঘ ভেসে-ভেসে গেলে

যেমন প্রতীতি হয়, মেঘ নয়, চাঁদ চলমান।

এখন জেনেছি সব, ...”[২৬]

চাঁদের উপর দিয়ে মেঘ ভেসে গেলে চাঁদকেও গতিশীল বলে মনে হওয়ার ভ্রান্তি আর কবির প্রেমিকার অভিসারে আসার ভ্রান্তি উপমাচিত্রে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। এই অভিজ্ঞতা যখন অর্জিত হল তখন কবি বুঝলেন—“ বালুময় বেলাভূমি চিত্রিত করার পরেকার/ তরঙ্গের মতো লুপ্ত, অবলুপ্ত তুমি, মনোলীনা।’[২৭] বালুময় বেলাভূমি চিত্রিত করলেই তারতারই আনুষঙ্গিক হয়ে আসে তরঙ্গের আবশ্যিক চিত্ররূপায়ণ। একটি আর একটির পরিপূরক। দুটো মিলেই একটি ছবির পরিপূর্ণতা বা সম্পূর্ণতা। কিন্তু বালুময় বেলাভূমি থেকে তরঙ্গ যদি চলে যায় তাহলে তা নিছক বালির ঊষর ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

‘অভিসার’-ও কখনো একক ভাবে পূর্ণ হতে পারে না। তা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যহীন নয়। তার নির্দিষ্ট অভিমুখের প্রয়োজন হয়। ঠিক অনুরূপভাবেই কবি প্রেমের যে বেলাভূমি রচনা করেছিলেন তাতে তাঁর প্রেমিকার প্রেম তরঙ্গের মতোই উচ্ছল হয়ে উঠবে— এমনটাই ভেবেছিলেন। কিন্তু কবি শঙ্খ ঘোষের মতো

কবি বিনয় মজুমদারও ক্রমে জেনেছেন—“আমিই আমার নিজের হাতে রঙিন ক’রে দিয়েছিলাম/ ছলছলানো মুখোশমালা, সে কথা তুই ভালই জানিস—’[২৮] ফলে তাঁর প্রিয়া সেই অর্থে অভিসারে আসেনি তাঁর কাছে। অভিসার তাই অপূর্ণ থেকে গেছে কবির জীবনে—বেলাভূমি চিত্রিত করার পর তরঙ্গের অনুপস্থিতির মতোই । তাই সে জীবনও রিক্ত, ঊষর, প্রেমহীন। প্রিয় মানবী ‘লুপ্ত’ থেকে ক্রমে ‘অবলুপ্ত’ হয়ে গেছে কবির জীবন থেকে। আজ সে কেবল জীবনানন্দীয় নায়িকার মতোই কবির কাছে—‘আকাশলীনা’, ‘মোনোলীনা’। তাকে লক্ষ্য করে জীবনানন্দের মতো কবি বিনয়ও বলতে পারেন—

“সুরঞ্জনা, তোমার হৃদয়ে আজ ঘাস:

বাতাসের ওপারে বাতাস—

আকাশেরঅপারেআকাশ।”[২৯]

জীবনানন্দ অবশ্য দূর থেকে আরো দূরে মিলিয়ে যাওয়া সুরঞ্জনার কাছে কাতর মিনতি রেখেছিলেন—

“ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে;

ফিরে এসো হৃদয়ে আমার;

দূর থেকে দূরে—আরো দূরে

যুবকের সাথে তুমি যেওনাকো আর।”[৩০]

কবি বিনয় মজুমদারও ‘লুপ্ত’ আর ‘অবলুপ্ত’—প্রায় সমার্থক শব্দদুটিতে অর্থের সামান্য অন্তর সৃষ্টি করে দূর থেকে আরো দূরের ক্রম রচনা করেছেন। তিনিও জীবনানন্দের মতো প্রিয়তমাকে পাবার প্রত্যাশায় বুক বাঁধতে চেয়েছেন—‘তবুও প্রয়াস পড়ে আছে’। তাই অন্যত্র তাঁকে বলতে শুনি—“...অগণন কুসুমের দেশে/ নীল বা নীলাভবর্ণ গোলাপের অভাবের মতো/ তোমার অভাব বুঝি; কে জানে হয়তো অবশেষে/ বিগলিত হতে পারো;”[৩১]

আগেই বলেছি, প্রেমিকার মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়া কবির লেখনীতে আহত মাছের চিত্রকল্পে রূপ পেয়েছে। গায়ত্রীর চলে যাওয়া কিংবা প্রত্যাখ্যানে হয়তো মিশে গিয়েছিল এই যন্ত্রসভ্যতার অনেক জটিল

প্রয়োজন, অনেক ঘোলা জল কিংবা কোনো কঠিন আঘাত। হয়তো সে কারণে তাকেও তার চারদিকে আত্মরক্ষার তাগিদে গড়ে তুলতে হয়েছিল কাঁটাবেড়ার দুর্ভেদ্য প্রাচীর। জীবনের বিকাশ সেখানে শঙ্কিত পদক্ষেপে'দ্বিধাথরথর'। হয়তো এ কারণেই কবির উচ্চারণ—" শিশুদের আহার্যের মতোন সরল হও তুমি,/ সরল, তরল হও; বিকাশের রীতিনীতি এই।"[৩২]এ বিকাশ জীবনেরই হোক, কিংবা প্রেমের—উভয় ক্ষেত্রেই একথা সমানভাবে সত্য।

যদি ধরে নেই, কবির এ উচ্চারণ গায়ত্রীর জন্যই, তাহলে এই উচ্চারণে হৃদয়ের কি দ্বিধা, সংশয়, নিরুচ্চার অভিমান জমাট হয়েছিল তার পরিচয় মেলে ২০০২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকাকে দেওয়া গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের এক বেতার সাক্ষাৎকারে। তিনি আনন্দবাজার-কে জানিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি কবি বিনয় মজুমদারের অনুরূপ অনুভূতির কথা তিনি জানতেন না—"সত্যিই আমি জানতাম না বিনয়ের মতো একজন কবি আমাকে নিয়ে এত সুন্দর সুন্দর সব কবিতা লিখেছিলেন, ...এ তো সত্যিই এক বাঙালি দান্তের কীর্তি তাঁর ঈশ্বরীকে নিয়ে।" যদি গায়ত্রীর এই বক্তব্যে সত্যতা থাকে, তাহলে বলতে হয়, তার দিক থেকে প্রেমের দরজা বন্ধ। তবু সেই অবরুদ্ধ প্রেমের দরজা খোলার জন্য কবির কি দীর্ণ আকুতি—

" বৃক্ষের প্রত্যঙ্গ নড়ে—এই দৃশ্য দেখেই কখনো
সে নিজে দোলোনক্ষম—এই কথা পাখিদের মতো
ভুল ক'রে ভেবেছো কি, তোমার বাতাসে সে তো দোলে।"[৩৩]

'ভুল করে ভবেছ কি'—কথাটার সঙ্গে আনন্দবাজারকে দেওয়া গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের সাক্ষাৎকার কোথায় যেন মিলে যায়। অচরিতার্থ প্রেমের এক বিষণ্ণ অনুভব যেন কবির মতো আমাদেরও ঘিরে ধরে। কিন্তু কবি "বিষণ্ণতার গভীরে চিরস্থিতিশীল আসন পাতেন নি। বরং যুক্তিবোধে স্থিত থেকে বুঝেছেন 'একদিন পালকের মতো ঝরে যাব'। উপলব্ধি করেছেন—"আর যদি নাই আসো, ফুটন্ত জলের নভোচারী/ বাষ্পের সহিত যদি বাতাসের মতো না-ই মেশো/ সেও এক অভিজ্ঞতা;'। সেই অভিজ্ঞতার স্থিতধী চেতনায় বিষণ্ণ অনুভূতির গভীরতা থেকে জেগে ওঠে ঋদ্ধ মননকল্পনা—

" হাসির মতন তুমি মিলিয়ে গিয়েছ সিন্ধুপারে।

এখন অপেক্ষা করি, বালিকাকে বিদায় দেবার

বহুপরে পুনরায় দর্শনের অপেক্ষার মতো—

হয়তো সর্বস্ব তার ভরে গেছে চমকে চমকে

অভিভূত প্রত্যাশায় এরূপ বিরহব্যথা ভালো।'''[৩৪]

কবি বিনয় মজুমদারের কবিতা প্রসঙ্গ আর প্রকরণের যে অনবদ্য মেলবন্ধন সেকথা আগেই বলেছি। তাঁর অনুরূপ একটি কবিতা হল 'রবীন্দ্রনাথ'। এ কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যায়ন রচনা করতে চেয়েছেন। কবিতার শুরুতেই আছে একটি তীর্যকতার প্রতিভাস—'তবে তো রবীন্দ্রনাথ আশা আছে'। এই 'আশা'র কথা শোনাতে গিয়ে কবি পরপরই বলেছেন—'তুমি আছো কলকাতা থেকে দূরে গ্রামে/ যেখানে সমস্যা আর সমাধান পাশাপাশি শুয়েথাকে প্রকৃতি রয়েছে'[৩৫]। একথা ঠিকই যে, কবি রবীন্দ্রনাথ আজীবন তাঁর কাব্যে জীবন আর প্রকৃতিকে এক সূত্রে মেলাতে চেয়েছেন, সীমা আর অসীমের সেতু রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। প্রকৃতিকে দিয়ে জীবনকে বুঝেছেন কিংবা জীবনকে প্রকৃতির সমান্তরাল প্রতিভাস দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সীমায় আবদ্ধ সঙ্কীর্ণ গ্লানিময় জীবনের একটি স্বতন্ত্র মুক্তিকে খুঁজেছেন বৃহৎ প্রকৃতির শুদ্ধতা, পবিত্রতা আর সীমাহীন ব্যাপ্তির বহুমাত্রিক তাৎপর্যে। সুতরাং কলকাতা থেকে দূরে—শান্তিনিকেতনের মতো গ্রামে যেখানে আজো অমলিন প্রকৃতি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ যেন বিচিত্র অনুভবের ডালি সাজিয়ে আজো সাধারণ মানুষের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন। কেননা 'ব্যর্থকাম চিমনির গ্লানি রোজ আকাশের রাঙা গালে কালিমা লেপন সেখানে করে না'।

বিনয় মজুমদারের এ-কবিতায় এই বিষয়টিই 'আশা'র নিহিত ব্যঞ্জনা রচনা করেছে—যাতে তীর্যকতার আভাস স্পষ্ট। নাগরিক জীবন—যন্ত্রজীবন—ব্যর্থ, বিধ্বস্ত, আশাহত, বিকৃত জীবনের যে ক্লেদ ও গ্লানি তা রবীন্দ্রকবিতায় ধরা পড়েনি বলে বিনয় মজুমদারের অভিমত। অকপটে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জানান—

"...তুমি শিখেছো কেমনভাবে কথা বলে বিবাহিতা নদী।

এত জল নিয়েও সে অতি অকপটে চায় কার্তিকের কিছুটা শিশির।"[৩৬]

'বিবাহিতা নদী'—এই শব্দযুগ্মকের দ্বারা কবি বিনয় নদীর সাগরসঙ্গমের প্রতিভাসকে জাগিয়ে তুলেছেন। এ নদীর জীবনে তাই মিলন আছে—অর্থাৎ প্রেমে কিংবা জীবনে প্রাপ্তি আছে, পূর্ণতা আছে। চেয়েও না-পাওয়ার গ্লানি নিয়ে ক্ষয়ে যাবার মতো জীবনের অপহ্নব রবীন্দ্রকাব্যে তেমন নেই বলেই বিনয়ের অনুরূপ শব্দবন্ধের আয়োজন। যে নদীতে ভরা জল থাকে সে নদীও কখনো কার্তিকের কিছুটা শিশির পাবার জন্য 'অকপট' সাহসী হয়ে ওঠে। তেমনি রবীন্দ্রকাব্যের নায়ক-নায়িকারা বিবাহিত স্বামী কিংবা স্ত্রীর প্রেম পেয়েও ভালোবাসার একটা মুক্ত আকাশকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে দূরে কোথাও—দূরে দূরে— অন্য কোথাও অন্য খানে—যেখানে বিরহী কিংবা বিরহিনীর মন কেবল কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়িয়েছে। যেমন প্রেমের ক্ষেত্রে তেমন জীবনের ক্ষেত্রেওএকথা সত্য।

জীবনের সেই ভরা সৌন্দর্য আর তার উপচীয়মান মাধুর্যের সুন্দর ছবি রবীন্দ্রকাব্যে স্থান পেয়েছে বলে কবির অভিমত। এতে ক্লিন্ন জীবনের অভাবী রোদন আর শতচ্ছিন্ন জীবনের হীনমন্যতাবোধ তেমন নেই। তাই জীবনের এক নির্মল আর পবিত্র চেতনার বাণীবাহক হয়ে থাকেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনের ভরা সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে থাকেন রবীন্দ্রনাথ। কবি বিনয় তাই বলেন—

"...তুমি সেইখানে থাকো নদীর ভিতরে। তীরে কাশবনে হাত বোলাতেই

দেখা গেল তুমি এক বিরাট পুরুষ আহা হাজার মাইল লম্বা, তবে

তোমাকে তো এখানেই থেকে যেতে হবে এই গ্রামাঞ্চলে মরণ অবধি।"[৩৭]

নদীর ভিতরে, কাশফুলের ধবল সৌন্দর্যে জীবনের উচ্ছল আনন্দ আর নির্মলতার যে ভাব-অভিব্যঞ্জনা বস্তুত তাই-ই রবীন্দ্রকাব্যের পরিব্যাপ্ত সুর। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বিরাট হাজার মাইল লম্বা পুরুষ। কিন্তু এরপরেই কবি জানাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথকে ঐ গ্রামাঞ্চলেই থেকে যেতে হবে মরণ অবধি। কারণ নাগরিক জীবনের ক্লেদ, ক্লিন্নতা আর বিধ্বস্ত জীবনের কথাকার রবীন্দ্রনাথ নন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিনয়ের এই যে মূল্যায়ন, তার একটা ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস আজকের দিনে দাঁড়িয়ে করাটা অত্যন্ত জরুরী। পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এ কবিতাটি রচনার সময়কাল ১৩৮৩-এর শ্রাবণমাস। তখন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর মাত্র তিরিশটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা দেখেছি, বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই রবীন্দ্রসমালোচনার একটি বিরোধী হাওয়া তীব্র থেকে তীব্র হয়ে উঠেছিল

বাংলাদেশে। এই সমালোচনা যে অধিকাংশক্ষেত্রে গঠনমুখী ছিল না, শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথকে কুৎসিৎভাবে আক্রমণের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল, তা অন্তত আজকের দিনে আমাদের কাছে প্রমাণিত সত্য। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে কুৎসা, যে অপপ্রচার চলেছে তা রবীন্দ্রনাথের মতো বনস্পতির পক্ষেই হয়তো মুখ বুজে সহ্য করা সম্ভব হয়েছিল। 'কল্লোল' প্রকাশিত হবার পর থেকে তা যে কতকটা তীব্র ও অমানবিক হয়ে উঠেছিল তা-ও আমরা জেনেছি। কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের সে স্থৈর্যে ফাটল ধরেছে, কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া নানা রচনায় তিনি ব্যক্ত করেছেন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ সে নিন্দা বা কুৎসা থেকে অনেক দূরে থেকেছেন—অন্তত থাকতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে অপদস্থ বা কলুষিত করার সেই ধারাটি যে বাংলা সাহিত্যের কর্ষিত ভূমি থেকে আজো মুছে যায়নি তার প্রভূত দৃষ্টান্ত চয়ন করে দেখানো যেতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধ তার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়।

বিনয়ের প্রথম কাব্যের প্রকাশ ১৯৫৮-তে। তার বহু আগে থেকেই তিনি বাংলা সাহিত্য ও বাংলা কবিতা বিষয়ে চর্চা করে আসছিলেন। রবীন্দ্রবিরোধের যে কুৎসিৎ ঘোলা জল বাংলাসাহিত্যের একুল ওকুলকে পরিপ্লাবিত করে বয়ে গেছে তা হয়তো বা বিনয়ের মনকে স্পর্শ করে থাকবে। কিংবা বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রসাহিত্যের যে অবমূল্যায়ন বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে আজ পর্যন্ত বহমান, তা কোথাও হয়তো ছয়ের দশকের কবি বিনয় মজুমদারের চেতনাস্রোতকেও প্রভাবিত করে থাকবে। হয়তো সেকারণেই তার পক্ষে ভাবা সম্ভব হয়েছে শুভ্রতা আর পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে হয়তো মৃত্যু পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলেই থেকে যেতে হবে!

প্রকারান্তরে বলি, প্রত্যেক স্রষ্টার সাহিত্যাদর্শ স্বতন্ত্র হতেই পারে। সাহিত্যের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে সেভাবেই রবীন্দ্রনাথ কোনকালেই স্বীকার করেনি। জীবনের ক্লিন্ন ক্লেদাক্ত পরিসরকে, তার ভঙ্গুর আর ক্ষয়িষ্ণু রূপকে সাহিত্যের পরিসরে বড় করে উপস্থাপন করতেই হবে—এটা বিশেষ সাহিত্যিক মতাদর্শ হতে পারে, সর্বজনীন মতাদর্শ কখনোই নয়। বিদেশের মাটিতে যেদিন এমিল জোলা নর্দমার সমস্ত পাঁককে তুলে এনে সাহিত্যের মন্দিরে জড়ো করে তুলেছিলেন তার কি ভয়ঙ্কর বিকার ঘটেছিল সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও অনভিজ্ঞ ছিলেন না। আজও রূপকথার গল্পের জন্য আমাদের মন টানে। আজও পাঠক রূপকথা-উপকথার গল্পের মধ্যে বাস্তবের অচরিতার্থ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার সহজ চরিতার্থতার ছবি দেখে মানসিক শান্তিলাভ করে।

রবীন্দ্রকবিতা কিংবা গান আমাদের কাছে সেই উপশম, অস্তিত্বের বিশল্যকরণী। শুধু গ্রামে নন, বেঁচে আছেন নগরের আবদ্ধ পরিবেশে মুক্তির নিশ্বাসের মতোই, আমাদের অস্তিত্বের সকল প্রান্তকে ব্যাপ্ত করে।

এমনটা না ভেবে একটু অন্যরকম ভাবা যাক। রবীন্দ্রকাব্যে সত্যিই কি জীবনের ক্লেদাক্ত, ক্লিন্ন পরিসর—না-পাওয়া জীবনের ক্ষয়িষ্ণু ছবি ফুটে ওঠেনি? হ্যাঁ, বলতে পারেন, কল্লোলীয়দের মতো করে রবীন্দ্রনাথ বলেননি, জীবনের কালো অন্ধকারকে, বিবিক্ততাকে সেই মাত্রায় রূপ দেননি। সেটা যে তাঁর নিজস্ব স্বতন্ত্র সাহিত্যাদর্শ সেকথা আগেই বলেছি। কিন্তু তাঁর ‘বাঁশি’ কবিতার হরিপদ কেরানি, ‘ছেলেটা’ কবিতার ছেলেটা, ‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতার সাধারণ মেয়েটি, ‘ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি’র প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকাটির মত এমন বিস্তর উদাহরণ শুধু ‘পুনশ্চ’ নয়, রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের অধিকাংশ কাব্য থেকে আমরা চয়ন করতে পারি যাতে জীবনের ক্লেদাক্ত, ক্ষয়িষ্ণু পরিসর মূর্ত হয়ে উঠেছে । সুতুরাং রবীন্দ্রনাথকে শুদ্ধতা আর পবিত্রতার পূজা অর্পণ করার আবহমান বাঙালি কাল্ট কোথাও হয়তো বিনয়ের মনকে ছুঁয়ে থাকবে। হয়তো বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-কবিতায় ভাবের উপর-স্তরের স্বচ্ছ স্রোতকে ছাড়িয়ে গভীরে ডুব দিলে যে বাঁক-প্রতিবাঁকের জটিল ব্যূহের কথা বলেছিলেন—যা পাঠককে প্রতি মুহূর্তে বিপথচালিত করতে পারে বলে সতর্কও করেছিলেন— কবি বিনয় মজুমদারে তার কিছু অপহ্নব ঘটা আশ্চর্যের কিছু নয়। কবিতার এই অংশে খুব সম্ভব তেমনটাই ঘটেছে বলেই আমার ধারণা।

কবিতার পরবর্তী অংশে কবি বিনয় মজুমদার জানাচ্ছেন—“ তোমার অভিজ্ঞ ছন্দ, হৃদয়ের রস বোঝে যারা মুখোমুখি ব’সে পায় তারা/ তোমার কবিতা বোঝে, শুধু তারা—এইসব নভোচারী ধবল বলাকা।”[৩৮] একথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথ আজীবন তাঁর কাব্যের মধ্যে ছন্দ নিয়ে যে প্রচুর এক্সপেরিমেন্ট করেছেন, যে গভীর মননের স্বাক্ষর রেখেছেন, তার গভীর বহুমাত্রিক তাৎপর্যকে বোঝার জন্য পাঠককে অবশ্যই মননশীল পাঠক হতে হয়। কিন্তু ‘এইসব ধবল বলাকা’-কথাক’টির মধ্যে একধরনের তীর্যকতা আছে। ধবল বলাকা যেন মাটির স্পর্শ এড়িয়ে নভোচারী কল্পনায় ভর করে উড়ে চলা এক শ্রেণীর সাহিত্যবোদ্ধার প্রতীক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রকাব্যের উচ্চদর্শন, কৌলীন্য সকল পাঠক সেদিন বোঝেনি, আজও নয়—একথা সত্য। কিন্তু নিছক তা ‘নভোচারী’ এইকথাও অনেকাংশে ঠিক নয়।

সাধারণ মেধার পাঠক, বা নিম্ন মেধার পাঠক রবীন্দ্রকাব্যের স্বরূপ বুঝতে পারেনি, কতিপয় ‘ধবল বলাকা’র দৃষ্টিকোণ রবীন্দ্রকাব্যের যে মাপকাঠি সেদিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, তারি সুরে সুর মিলিয়েছিল তারা—এমনটা বলেছেন কবি বিনয়। এর মধ্যে রবীন্দ্র-কবিতার সনাতন বিশ্লেষকদের প্রতিও এক তীর্যক দৃষ্টি হেনেছেন বিনয়। কিন্তু তাঁদের অনেকেই কিন্তু কখনোই অনুরূপ শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না।তাছাড়া রবীন্দ্রকবিতার গভীরে স্রোত-প্রতিস্রোতে কোন হাঙরের কামড় আছে সে বিষয়ে শালিকের মতো সাধারণ পাঠকেরা সচেতন না থাকলেও তারা কিন্তু তাঁর কবিতার উপরের স্তরে সীমাবদ্ধ থেকেও কাব্যপাঠের আনন্দ থেকে যে বঞ্চিত হয় না—আজকের দিনেও সপ্তাহান্তে যখন বেস্ট সেলিং বইয়ের তালিকায় প্রায়শই রবীন্দ্ররচনাবলীকে জায়গা করে নিতে দেখা যায়— তাতেই এর পরিচয় মেলে।

ফলে, সাধারণ পাঠক রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের জীবনের থেকে বহুদূরের এক নক্ষত্র হিসেবে ভেবে ‘কী যেন করেছো তুমি’ বলে তাঁর রচনা থেকে ক্রমে দূরে সরে গেছে, তাদের জীবনের সাথে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রতিফলিত জীবনের যোগ নেই বলে ‘দায়ে প’ড়ে’ রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসেবে মেনে নিয়েছে, এমন অভিযোগ—আজকের দিনে অন্তত মেনে নিতে অনেক পাঠকই দ্বিধান্বিত হবেন। বিরোধী মতের কেউ কেউ হয়তো রবীন্দ্রনাথের ‘ঐকতান’ কবিতার পঙক্তি চয়ন করে প্রমাণ করতে বসবেন রবীন্দ্রনাথ ‘কৃষাণের জীবনের শরিক’ হয়ে উঠতে পারেননি, ‘কর্মে ও কথায় আত্মীয়তা’ অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু ‘ঐকতান’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বিনয়ের সঙ্গে যা বলেছেন তার কতটা আক্ষেপ আর কতটা সত্য তাঁর চিঠিপত্রগুলিকে পাশাপাশি রেখে পড়লেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিরোধী মত যাঁদের, তাঁদের উদ্দেশ্যে জানাই, কর্মী রবীন্দ্রনাথকে জানুন, তাঁর কবিতাগুলিকে তারই নিরিখে নতুন করে পড়ুন ও মূল্যায়ন করুন, একালের রবীন্দ্র-গবেষকদের নতুন নতুন আবিষ্কারে চোখ রাখুন। দেখবেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে নবীন ভাষ্যে উপস্থিত।

যে কবি নিজের মুখেই বলেন—‘আমি পৃথিবীর কবি/ যেথা তার যত উঠে ধ্বনি/ আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি’ তাঁর বাঁশির সুর থেকে কৃষাণের জীবনভাবনা বাদ পড়ে যাবে তা-ও কি সম্ভব? যে মানুষটি সেই ১৮৮৯ থেকে পল্লীর মানুষের মাঝেই বাসা বেঁধেছেন, তাঁদের দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গী হয়েছেন এবং আমরণ তাদের সঙ্গে থেকে তাদের জন্যই নানা কর্মপরিকল্পনাকে গেঁথে তুলেছেন, ‘আমি তোমাদেরি লোক’—এই পরিচয়ে বাঁচতে চেয়েছেন—তিনি কাব্যে তাঁদের জীবনকে ধরে দেখাননি? ‘এসকল মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা/ এ সকল শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা’—এমন ঘোষণা রেখে সেই

'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার মধ্য দিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের যে যাত্রা শুরু, তা তাঁর কাব্যের উপান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। যে কবিতায় একদা ছিল আদর্শের তারল্য, তা ক্রমে মাটির সমতলে কীভাবে নেমে এসেছে, তা তাঁর শেষ পর্বের অনেক কবিতাতেই ছড়িয়ে রিয়েছে। রবীন্দ্রকবিতার তন্নিষ্ঠ পাঠের জন্য তাই বিরোধীদের পুনর্বার আহ্বান রইল— আহ্বান রইল কিছু ভ্রান্তি নিষ্কাষণের। সেক্ষেত্রে আলোচ্য কবিতার শেষাংশে বিনয়ের রবীন্দ্র-মূল্যায়নে যে তীর্যকতার আভাস রয়েছে তার যাথার্থ্য অনুধাবন করা যাবে বলেই মনে করি—

" এদের রটনা শুনে শালিকেরা দায়ে প'ড়ে মেনে নেয় তুমি এক কবি।

কে না জানে পৃথিবীকে খুব খুব বেশী দূর থেকে অন্য গ্রহ থেকে দেখলেই

একটি নক্ষত্র ব'লে মনে হয়, এই সত্য চিরদিন মনে ক'রে রেখে

কী যেন করেছো তুমি—এই ব'লে শালিকেরা আরও দূরে স'রে যেতে যেতে।"[৩৯]

বিনয় মজুমদারের 'আমাদের বাগানে' কাব্যগ্রন্থটি লেখা হয় ১৯৮৪ তে। ততদিনে কবি বিনয় লিখে ফেলেছেন 'বাল্মীকির কবিতাগুচ্ছ' কিংবা 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা'র মতো কাব্যগ্রন্থগুলি। 'বাল্মীকির কবিতাগুচ্ছে'র বিষয়ে যে অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা'র মধ্য দিয়ে কবি বিনয় প্রকৃতি আর বৃহৎবিশ্বের মধ্যে অনিবার যাতায়াতের যে স্বাক্ষর রাখেন 'আমাদের বাগানে' কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় তারই প্রতিফলন চোখে পড়ে। 'মানুষের আলো' কবিতাটি এরই পরিচয়বাহী।

এ কবিতার শুরুতেই কবি জানিয়েছেন—"আকাশে সূর্যের আর নক্ষত্রগুলির আলো আছে তবে কোনো ছায়া নেই'। সূর্য আর নক্ষত্রের এই নিজস্ব ভাস্বরতার প্রেক্ষাপটে কবি জানান—'মানুষের সৃষ্টি সব আলোতেই ছায়া আছে'। প্রদীপ, কুপি, মোমবাতি, হ্যারিকেন, লণ্ঠন, বৈদ্যুতিক বাতির তালিকা দিয়ে কবি জানিয়েছেন এদের 'আলোর পাশেই ছায়া থাকে'। এই আলো আর ছায়া কবিতায় প্রতীকী তাৎপর্য পেয়ে যায় যখন কবি ঠিক এর পরপরই উচ্চারণ করেন—

"মানুষ সূর্যদেবের আলোক বোঝার চেষ্টা করে আর নক্ষত্রদিগের—

বশিষ্টঋষির আলো মরীচি ঋষির আলো আমিও বোঝার চেষ্টা করি।

আলোকের কত বর্ণ, আলোকের গুণাগুণ—এসব জেনেছি কিছু কিছু।"[৪০]

বোঝা যায়, এ আলোকে বহুমাত্রিক তাৎপর্য রয়েছে। কেননা এ 'আলোকের কত বর্ণ'—গুণাগুণ—তার ইয়ত্তা নেই। হতে পারে তা পরিপূর্ণ জ্ঞানের আলোক, হতে পারে তা পরিপূর্ণ চেতনার আলোক, হতে পারে তা শ্রেষ্ঠ মানবমহিমার আলোক—এমন আরো অনেক কিছু। এই আলোকের তাই কোনো ছায়া নেই—অর্থাৎ কোনো দোষ বা কলঙ্ক নেই, সঙ্কীর্ণতার কালি নেই। বশিষ্ট ঋষি কিংবা বিশ্বামিত্রের তপস্যা ও ত্যাগের মধ্যে যে নিষ্কলুষ মহত্ত্বের সাধনা রয়েছে তা মানবজাতির কাছে আজো শিক্ষনীয় ও অনুকরণীয় বিষয় হয়ে আছে।

এই আলোক কোনো মানুষের পক্ষে অর্জন করা অসম্ভব নয়। সাংসারিক সঙ্কীর্ণতা আর মলিনতা মানবের চেতনাকে গ্রাস করে থাকে। সেটাই তার চৈতন্যের ছায়া—যা এ কবিতায় প্রতীকী তাৎপর্যে রূপায়িত। দেবতা কিংবা নক্ষত্রসমান মানুষের মধ্যে এই ছায়া থাকে না। কবির মতো মর্ত্যপৃথিবীর সঙ্কীর্ণচেতা মানুষেরা তাই দেবত্বের কিংবা নক্ষত্রের নিঃস্বার্থ অনিঃশেষ আলো প্রদানের তাৎপর্যকে বোঝার চেষ্টা করে। সে আলোর খোঁজ যারা একবার পায়, তাদের কাছে ঘরের সঙ্কীর্ণ ছায়াময় বা আসক্তিঘেরা দেওয়াল ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আলোর সেই বৃহৎব্যাপ্তিকে ছোঁয়ার জন্য তখন মানুষ বৃহৎজীবনের অনিঃশেষ পথ হাঁটে। তখন সাংসারিক ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়াগুলো আমাদের কাছে কালো হয়ে যায়। তখন মনে হয়—'লাভক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ—/ কলহ সংশয়।/ সহে না সহে না আর, জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি/ দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।।'[৪১]তখনি উচ্চারণ করা যায়—

"প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে

মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।

তব ভুবনে তব ভবনে

মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান ॥

আরো আলো আরো আলো

এই নয়নে, প্রভু, ঢালো।

সুরে সুরে বাঁশি পুরে

তুমি   আরো আরো আরো দাও তান ॥

আরো বেদনা আরো বেদনা,

প্রভু,   দাও মোরে আরো চেতনা।

দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে

মোরে   করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ।

আরো প্রেমে আরো প্রেমে

মোর   আমি ডুবে যাক নেমে।

সুধাধারে আপনারে

তুমি   আরো আরো আরো করো দান।।"[৪২]

এর জন্যেই প্রয়োজন হয় 'এ আমির আবরণ'-কে খুলে ফেলার। এক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আর এক মহাজীবনকে বরণ করে নেবার—যেমন করে 'ডাকঘরে'র অমল করেছিল, 'মুক্তধারা'র অভিজিৎ করেছিল, 'রক্তকরবী'র রাজা করেছিল—এমন কত অজস্র উদাহরণ শুধু সাহিত্যে নয়, আমাদের চারপাশে ছড়ানো রয়েছে—মনীষীদের জীবনই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শুধু এর জন্য প্রয়োজন হয় আত্মশুদ্ধির। মানবসমাজ কিংবা ব্যক্তিমানুষ যখন সেই আত্মশুদ্ধি—অর্থাৎছায়া-মুক্তির তাগিদ বা প্রয়োজনীয়তা অন্তর থেকে উপলব্ধি করেছে তখনিই সে-ও এই আলোক-পথের যাত্রী হয়েছে, চৈতন্যের আলোককে বহুগুণিত করে তুলতে চেয়েছে। কবিতার অন্তিমে আছে তারই প্রতীকী সহজ রূপায়ণ—

"প্রয়োজন হয় যেই অমনি মানুষজাতি নিজেদের আলো জ্বেলে নিই

নিজেদের আলোতেই দেখি, তবে মানুষের আলোয় সর্বদা ছায়া আছে

আর যা বাস্তবে দেখি তা হলো আলোর গতি সর্বোচ্চ এখনো!।[৪৩]

এখানেই কবি বিনয় অনন্য। পা তার ছুঁয়ে থাকে এই মাটির পৃথিবীকেই। তিনি জানেন, দেবত্বের যে আলোকে আমরা আমাদের চোখে ভরে নিতে চাই না কেন, তবুও আমরা রক্তমাংসের মানুষ। গলিত স্থবির ব্যাঙের মতো এ জীবন বেঁচে থাকার প্রত্যাশায় আরো দু'মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে। তাই সমুদ্রের অনুনয় প্রায়ই আমাদের জীবনে মিথ্যে হয়ে যায়। অথচ কানাকানি চলতেই থাকে জীবনের এপারে ওপারে। তাই 'লুপ্ত হয়ে গুপ্ত হয়ে আম্রবনছায়ে' জীবন কাটাতে গিয়েও কোন এক দমকা হাওয়ায় মনে জাগে বিপ্রতীপতার সুর—" এ যুগের নিয়তিই হল বাল্য আর প্রৌঢ়তা—মধ্যিখানের বিশাল চড়ায় ইচ্ছা আর অভিজ্ঞতা ভালোলাগা আর কর্তব্যের বিরোধে পোকার মতো গর্ত খুঁড়ে নীচে নামছি—অথচ সামনে সমুদ্র ছিল।"[৪৪]

জীবনের একদিকে এই সাগরচেতনা অন্যদিকে 'ছায়া'র টান, একদিকে ঘর অন্যদিকে পৃথিবী, একদিকে 'আমাদের বাগান' অন্যদিকে বিশ্বের বাগান আমাদের সত্তাকে অস্থির ,দ্বন্দ্বগভীর করে তোলে। তখন আমরাও আকুল হয়ে উচ্চারণ করি—'মন সরে না যেতে ফেলিলে একি দায়ে'। এই দায় থেকে মুক্তি পাবার জন্যই হয়তো আমরা নিজেদের মতো করে গড়ে তুলি কোনো মানবনিহিত মধ্যপন্থা। সেই পন্থা বা দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা জগৎকে ও জীবনকে দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু সেই দেখার মধ্যে তখন অনেক 'ছায়া' বা অশুদ্ধি বা মানবিক দুর্বলতা লুকিয়ে থাকে। ছায়ামুক্তি না ঘটলে তো দেবতা বা নক্ষত্রসদৃশ হয়ে ওঠা যায় না। তাই নিরন্তর চলে নক্ষত্রের ন্যায় নিজেকে আলোকময় করে তোলার প্রয়াস, ছায়াহীন করে তোলার চেষ্টা।

সে প্রয়াস অন্তহীন। তার জন্যেই কত ত্যাগ, কত দুঃখস্বীকার, কত দুঃখ অতিক্রমী মহৎপ্রয়াস। কিন্তু 'বাস্তব' এটাই যে, মানুষের আলো নিয়ে যতই আমরা জীবনকে পরিপার্শ্বকে দেখি-না কেন, সে দৃষ্টি সূর্য বা নক্ষত্রের আলোর ব্যাপ্তি বিস্তৃতি কিংবা গতিকে ছুঁতে পারে না। এ যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য তেমনি জীবনের মূলে নিহিত এক পরম সত্যও বটে। এই পরম সত্যের এষণা যে কবির অন্তরে, তার প্রকাশভঙ্গির শিল্পসংহতি—যা আমাদের প্রতিপল চকিত মুগ্ধ করে—তাকে বাতুলের দল 'পাগল' আখ্যা দিয়ে বাতুলতা করতেই পারে—সচেতন পাঠক কখনোই নয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাই কবি বিনয়কে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন—যা বাতুলসম্প্রদায়ের হয়তো চোখেই পড়েনি—" বিনয় মজুমদারের মতন কবি পৃথিবীর যে-কোন দেশেই দুর্লভ। বাংলাদেশ কবিতার দেশ—এটা নিতান্তই ছেঁদো কথা। যদি সত্যিই তাই হতো, বিনয় মজুমদারকে বাংলাদেশের মাথায় করে রাখা উচিত ছিল। অবশ্য, মাথায় করে রাখলেই যে বিনয় মজুমদার সেখানে থাকতেন, তা মনে হয় না, ওরকম কুস্থান তিনি অচিরে পরিহার করতেন, কিন্তু সেটা অন্য কথা।"[৪৫]

উৎস-নির্দেশ:

১. প্রেমেন্দ্র মিত্র। ২০০২ । সাগর থেকে ফেরা। দে'জ। পৃ: ৩৬।

২. বিনয় মজুমদার। ফেব্রুয়ারী ২০০৮। ৪নং সাক্ষাৎকার। মুখোমুখি বিনয় মজুমদার। কবিতীর্থ। পৃ: ৭৬-৭৭।

৩. বিনয় মজুমদার। ১৪০৫ । পরিশিষ্টমালা-ঙ। কাব্যসমগ্র, ১ম খণ্ড। প্রতিভাস। পৃ: ১২-১৩।

৪. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। ৬ সংখ্যক কবিতা। ফিরে এসো, চাকা। কাব্যসমগ্র, ১ম খণ্ড। প্রতিভাস। পৃ: ৪৪।

৫. বিনয় মজুমদার। ১৯৬৬। এই সব সত্য। কৃত্তিবাস পঞ্চাশ বছর : নির্বাচিত সংকলন (সম্পা. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) আনন্দ পাবলিশার্স।

পৃ: ৩৫৪।

৬. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। ৬ সংখ্যক কবিতা। পূর্বোক্ত।

৭. অমিত কুমার দাস। চন্দ্রসংকলন ২০১৮। জীবনায়ন ও কবি বিনয় মজুমদার : ফুল ও পাখির বিচিত্র কোলাজে। পলাতকা পত্রিকা (সম্পা. অমিত কুমার দাস)। পত্রলেখা। পৃ: ১৪০।

৮. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। ৩ সংখ্যক কবিতা। ফিরে এসো,চাকা। কাব্যসমগ্র, ১মখণ্ড। প্রতিভাস। পৃ: ৪৩।

৯. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। ৯ সংখ্যক কবিতা। ফিরে এসো, চাকা। পূর্বোক্ত।

১০. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। ২০ সংখ্যক কবিতা। ফিরে এসো, চাকা। কাব্যসমগ্র, ১মখণ্ড। প্রতিভাস।পৃ: ৫০-৫১।

১১. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। ৬ সংখ্যক কবিতা। ফিরে এসো, চাকা। কাব্যসমগ্র, ১মখণ্ড। প্রতিভাস।পৃ:৪৪।

১২. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। ৬৭ সংখ্যক কবিতা। ফিরে এসো, চাকা। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৯।

১৩. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। ৬ সংখ্যক কবিতা। ফিরে এসো, চাকা। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৪।

১৪. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। দূরত্ব। বাল্মীকির কবিতা। কাব্যসমগ্র, ২য় খণ্ড। প্রতিভাস।পৃ:৪৯।

১৫. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। ৬ সংখ্যক কবিতা। ফিরে এসো, চাকা। পূর্বোক্ত।

১৬. বিনয় মজুমদার। ফেব্রুয়ারী ২০০৮। ৬ নং সাক্ষাৎকার। মুখোমুখি বিনয় মজুমদার। কবিতীর্থ। পৃ: ৮৪-৮৫।

১৭. পূর্বোক্ত। ৮ নং সাক্ষাৎকার।

১৮. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। ৭৩ সংখ্যক কবিতা। ফিরে এসো, চাকা। কাব্যসমগ্র, ১ম খণ্ড। প্রতিভাস। পৃ: ৭১।

১৯. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। ১৮ সংখ্যক কবিতা। ফিরে এসো, চাকা। কাব্যসমগ্র, ১ম খণ্ড। প্রতিভাস। পৃ: ৫০।

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৪১২। ২৮ সংখ্যক গান, প্রেম পর্যায়। গীতবিতান ১ম খণ্ড। বিশ্বভারতী। পৃ: ২৮১।

২১. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। ১৮সংখ্যক কবিতা। ফিরেএসো, চাকা। কাব্যসমগ্র, ১ম খণ্ড। প্রতিভাস। পৃ:৫০।

২২. তদেব।

২৩. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। ৬৫ সংখ্যক কবিতা। ফিরে এসো, চাকা। কাব্যসমগ্র, ১ম খণ্ড। প্রতিভাস। পৃ: ৬৮।

২৪. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। ৪৭ সংখ্যক কবিতা। ফিরে এসো, চাকা। কাব্যসমগ্র, ১ম খণ্ড। প্রতিভাস। পৃ:৬১।

২৫. বিনয় মজুমদার। ডিসেম্বর ২০০২। আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব। ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য। প্রতিভাস। পৃ: ৫৬।

২৬. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। ২১ সংখ্যক কবিতা। ফিরে এসো, চাকা। কাব্যসমগ্র, ১ম খণ্ড। প্রতিভাস। পৃ: ৫১।

২৭. তদেব।

২৮. শঙ্খ ঘোষ। ২০১২। ফুলবাজার। নিহিত পাতালছায়া। শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ। পৃ: ৩২।

২৯. জীবনানন্দ দাশ। ২০০৩। আকাশলীনা। সাতটি তারার তিমির। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি। পৃ: ৮০।

৩০. তদেব।

৩১. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। ২০ সংখ্যক কবিতা। ফিরে এসো, চাকা। কাব্যসমগ্র, ১ম খণ্ড। প্রতিভাস। পৃ: ৪৬।

৩২. পূর্বোক্ত। ২১ সংখ্যক কবিতা।

৩৩. তদেব।

৩৪. অমিত কুমার দাস। চন্দ্র সংকলন ২০১৮। জীবনায়ন ও কবি বিনয় মজুমদার : ফুল ও পাখির বিচিত্র কোলাজে। পলাতকা পত্রিকা

(সম্পা. অমিত কুমার দাস)। পত্রলেখা। পৃ:১৪৮।

৩৫. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। বাল্মীকির কবিতা। কাব্যসমগ্র, ২য় খণ্ড। প্রতিভাস। পৃ: ৫০।

৩৬. তদেব।

৩৭. তদেব।

৩৮. তদেব।

৩৯. তদেব।

৪০. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। মানুষের আলো। আমাদের বাগানে। কাব্যসমগ্র, ২য় খণ্ড। প্রতিভাস। পৃ: ৮২।

৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৪২১। বর্ষশেষ। কল্পনা। বিশ্বভারতী। পৃ: ৪৭।

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৪২১। গীতবিতান ১ম খণ্ড। পূজা পর্যায়। বিশ্বভারতী। পৃ: ৫০।

৪৩. বিনয় মজুমদার। ২০১৪। মানুষের আলো। আমাদের বাগানে। কাব্যসমগ্র, ২য়খণ্ড। প্রতিভাস। পৃ:৮২।

৪৪. দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১২। অশ্বমেধের ঘোড়া। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পসমগ্র। একুশ শতক। পৃ: ২৫১।

৪৫. সনাতন পাঠক। জানুয়ারী ২০০৬। একটি অসাধারণ কবিতার বই। বিনয় মজুমদারের ডায়েরি (সম্পা. অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়)। শিলীন্ধ্র প্রকাশন। পৃ: ১৪৫।